بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ নভেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ১৯ নবুয়্যত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সাহাবীদের পূর্বাবস্থা এবং ইসলামগ্রহণ করার পর তাঁদের আচরিত জীবনে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উমর (রা.)'র একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদিও পূর্বেও এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি কিন্তু এখানে এ প্রেক্ষাপটেও বর্ণনা করছি। তিনি (রা.) লিখেছেন, দেখো! সাহাবীরা কীভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হয়েছেন আর কীভাবে তাঁরা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করেছেন। এভাবে যে তারা চেষ্টা-সাধনা করেছিলেন। নতুবা তারা তো সেসব লোকই ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু ছিল এবং তাঁকে গালিগালাজ করত। হযরত উমর (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর দ্বিতীয় খলীফা হন, প্রথমদিকে মহানবী (সা.)-এর এমন চরম শত্রু ছিলেন যে, তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে একজনের সাথে দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে, (উমর) কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করতে যাচ্ছি। সে ব্যক্তি বলে, প্রথমে নিজের বোন ও ভগ্নিপতিকে হত্যা কর, যারা মুসলমান হয়ে গেছে এরপর (না হয়) মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করো। একথা শুনে তিনি চরম রাগান্বিত হন এবং নিজের বোনের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে দেখেন (বাড়ির) দরজা বন্ধ এবং একজন পবিত্র কুরআন (পড়ে) শোনাচ্ছে আর তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি শুনছেন। তখনো পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয় নি, তাই সেই সাহাবী বাড়ির ভেতরে বসেছিলেন। হযরত উমর (রা.) দরজার কড়া নাড়েন এবং বলেন, দরজা খোলো। তাঁর আওয়াজ শুনে ভেতরের লোকদের মাঝে ভীতি সঞ্চার হয় যে, (আমাদের) হত্যা করবে; তাই তারা দরজা খুলে নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি দরজা না খোলো তাহলে আমি (দরজা) ভেঙ্গে ফেলব। তখন তারা কুরআন আবৃত্তিকারী মুসলমানকে লুকিয়ে রাখেন আর ভগ্নিপতিও লুকিয়ে পড়েন, শুধুমাত্র বোন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী করছিলে বল? আর কে ছিল যে কিছু পড়ছিল? তিনি ভয়ের কারণে কথা এড়াতে চান। হযরত উমর (রা.) বলেন, যা পড়ছিলে তা আমাকে শোনাও। তাঁর বোন বলেন, আপনি এর অবমাননা করবেন, তাই আমাদেরকে প্রাণে মেরে ফেললেও আমরা (আপনাকে তা) শোনাব না। তিনি বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমি কোনরূপ অবমাননাকর আচরণ করব না। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অসম্মান করব না। তখন তারা পবিত্র কুরআন শোনান, যা শুনে হযরত উমর (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং ছুটতে ছুটতে মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। তরবারি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, উমর এমন অবস্থা আর কতদিন চলবে? একথা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম কিন্তু আমি নিজেই শিকারে পরিণত হয়েছি।

এটি হলো পূর্বে বর্ণিত পুরো ঘটনার সারাংশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রথমে এমন ছিল তাদের অবস্থা, যা থেকে তারা উন্নতি করেছেন। আরো কিছু সাহাবীর কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সাহাবীরাই পূর্বে মদপান করতেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করতেন। আরো বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাঁরা যখন মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছেন আর ধর্মের খাতিরে উদ্যম দেখিয়েছেন ও চেষ্টা-সাধনা করেছেন, এর ফলে কেবল নিজেরাই উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হন নি বরং অন্যদেরকেও উন্নত মানে উপনীত করার কারণ হয়েছেন। তাঁরা সাহাবী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন নি বরং তারা অন্যদের মতই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমল করেছেন আর উদ্যম প্রদর্শন করেছেন ফলে সাহাবীতে পরিণত হয়েছেন। আজও যদি আমরা এমনটি করি তাহলে আমরাও সাহাবী হতে পারি।

হযরত উমর (রা.)'র খোদাভীতির অবস্থা কেমন ছিল– এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, ফুরাত নদীর তীরে যদি কোন একটি ছাগলও মারা যায় তাহলে আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, ফুরাত নদীর তীরে যদি কোন একটি উটও মারা যায় তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ তা'লা আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত উমর (রা.) সাথে যাই এমনকি তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করেন। আমার ও তাঁর মাঝে প্রতিবন্ধকস্বরূপ একটি দেয়াল ছিল। তিনি বাগানের ভিতরে ছিলেন। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, **'বাহ্ বাহ্ হে খাত্তাবের পুত্র উমর! তুমি এখন আমীরুল মু'মিনীন। খোদার কসম! আল্লাহ্‌কে ভয় কর নইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিবেন'**। হযরত উমর (রা.)'র আংটিতে এই বাক্য খচিত ছিল যে, **'কাফা বিল মওতে ওয়ায়েযান ইয়া উমারু', অর্থাৎ হে উমর! ওয়ায বা নসীহতকারী হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট।** অর্থাৎ মানুষ যদি মৃত্যুকে স্মরণে রাখে তাহলে এটিই উপদেশ প্রদানকারী একটি জিনিস আর নিজের অবস্থা সঠিক রাখার জন্য এটিই যথেষ্ট।

আব্দুল্লাহ্ বিন শাহ্‌যাদ বলতেন, আমি নামাযের শেষ সারিতে থাকা অবস্থায় হযরত উমর (রা.)'র কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন, إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ আমি তো আমার দুঃখ বেদনা কেবল আল্লাহ্‌র সমীপেই নিবেদন করে থাকি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এই রেওয়ায়েতটি একটি খুতবায় উল্লেখ করেছিলেন এবং নিজ ভাষায় এর খানিকটা ব্যাখ্যাও এভাবে করেছিলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাহ্‌যাদ বলেন, একবার হযরত উমর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন তখন আমি শেষ সারিতে ছিলাম কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর কাকুতিভরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর তিনি আয়াত পাঠ করছিলেন, إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, আমি তো আমার প্রভুর সমীপেই আমার সব কাকুতিমিনতি উপস্থাপন করব অন্য কারো সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। অতএব, যারা যিকরে এলাহীতে রত থাকে তারা খোদার দরবার ছাড়া আর কোন দরবার পায়ই না যেখানে নিজের দুঃখকষ্টের আকুতি জানিয়ে নিজেদের বুকের বোঝা হালকা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শেষ সারিতে থাকলেও সেখান থেকে হযরত উমর (রা.)'র বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

প্রবীণ সেবক এবং ত্যাগ স্বীকারকারীদের প্রতি হযরত উমর (রা.) কীভাবে খেয়াল রাখতেন– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত সা'লাবা বিন আবু মালেক বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মদীনায় বসবাসকারী মহিলাদের মধ্য হতে কতকের মাঝে ওড়না বিতরণ করেন। কিছু উন্নতমানের ওড়না হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ভালো ওড়না রয়ে যায়। তাঁর পাশে যারা ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এটিকে মহানবী (সা.)-এর সেই কন্যাকে দিয়ে দিন যিনি আপনার কাছে আছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)'র কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের কথা বলছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, না, হযরত উম্মে সালীদ এর বেশি অধিকার রাখে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত উম্মে সালীদ সেসব আনসার মহিলাদের অন্যতম যারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন আমাদের জন্য মশক বহন করে নিয়ে আসতেন।

এছাড়া কুরবানীকারীদের নিকটাত্মীয়দেরও পুরস্কৃত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার বরাতে বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে বাজারে যাই। একজন যুবতী মহিলা পেছন থেকে এসে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী মারা গেছে এবং ছোট ছোট বাচ্চা রেখে গেছে। আল্লাহর কসম! তাদের ভাগ্যে ছাগলের পা-ও জুটছে না। তাদের কোন ক্ষেতখামারও নেই আর দুধের কোন প্রাণীও নেই। আমি সঙ্কিত যে, পাছে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার না হয়ে যায়। আমি খোফা বিন ইমা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর সাথে হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) থেমে যান এবং সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বললেন, **বাহ্ বাহ্! খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।** অতঃপর হযরত উমর (রা.) ফিরে গিয়ে ঘরে বাঁধা একটি শক্তিশালী উট নিয়ে দুই বস্তা শস্যদানা ভরে উটের ওপর চাপালেন এবং এর সাথে সারা বছরের খরচের জন্য অর্থ ও কাপড়ও রাখলেন। অতঃপর সেই উটের লাগাম সেই মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে যাও। এটা শেষ হবার পূর্বেই আল্লাহ্ তোমাকে আরো দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার প্রতি ধিক্কার, অর্থাৎ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন; আল্লাহর কসম! আমি এখনো তার পিতা এবং তার ভাইকে দেখতে পাচ্ছি। তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন যা তারা অবশেষে জয় করেছেন। অতঃপর সকালে আমরা তাদের উভয়ের অংশ আমাদের মধ্যে বণ্টন করলাম, অর্থাৎ দুর্গ তারা জয় করেছিল, যার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব মুসলমান ভোগ করে। বলতে গেলে আমরা তাদের অংশ থেকে বণ্টন করেছি। অতএব এ কারণেই সে কিছু পাওয়ার যোগ্য।

বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং অভাবী নারী ও মানুষের প্রতি কীভাবে খেয়াল রাখতেন– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত তালহা (রা.) বলেন, একদা হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের হন, হযরত তালহা (রা.) তাঁকে দেখে ফেলেন। হযরত উমর (রা.) একটি বাড়িতে প্রবেশ করেন, এরপর অন্য আরেকটি বাড়িতে প্রবেশ করেন। প্রভাতে হযরত তালহা (রা.) সেসব বাড়ির একটি বাড়িতে গেলেন, সেখানে একজন অন্ধ বুড়ি বসে ছিল। হযরত তালহা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে রাতে আসে সে এসে কী করে? বৃদ্ধা উত্তরে বলে, তিনি অনেক দিন ধরে আমার সেবা করছেন, আমার কাজ করে দেন এবং আমার ময়লা পরিষ্কার করেন।

একথা শুনে হযরত তালহা (রা.) অনুতাপের সঙ্গে নিজেই নিজেকে বলেন, হে তালহা! ধিক তোমার প্রতি। কী দুঃখের বিষয় যে, তুমি উমরের ছিদ্রান্বেষণে রয়েছ? এখানে বিষয় তো একেবারেই ভিন্ন। প্রজাসেবার এই মহান মানই হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেন।

জনসাধারণ, অভাবী নারী ও শিশুদের চাহিদা পূরণের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র অনেক ঘটনা রয়েছে। গভীর খোদাভীতির সাথে তিনি (তাদের) চাহিদা পূর্ণ করতেন। আর তিনি (তাদের জন্য) বিচলিত হয়ে যেতেন। যখন তিনি দেখতেন যে, তার কোন প্রজার চাহিদা পূরণ হয় নি তখন তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হতেন। কিছু উদাহরণ আমি গত কয়েক সপ্তাহের জুমুআতে বিভিন্ন পেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছি। যেমন– তিনি একবার যখন রাতে একজন মহিলাকে তার বাচ্চার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সে বলেছিল যে, উমর (রা.) যেহেতু দুগ্ধপায়ী শিশুদের জন্য রেশন নির্ধারণ করেন নি। তাই আমি বাচ্চাকে খাবার খাওয়ার অভ্যাস তৈরির জন্য দুধ দিচ্ছি না, তাই সে ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি করছে। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পানাহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। এরপর ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুকে রেশন দেয়া হবে। একইভাবে একবার একজন মুসাফির মহিলা, যার কাছে খাওয়ার কিছুই ছিল না। আর রাতে বিরতির জন্য শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল এবং বাচ্চারা ক্ষুধায় কাঁদছিল তিনি যখন রাতে তা জানতে পারেন তাৎক্ষণিকভাবে ভাণ্ডার থেকে পানাহার সামগ্রী বহন করে তার কাছে পৌঁছে দেন এবং বিচলিত হয়ে পড়েন আর ততক্ষণ স্বস্তি পান নি যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার রান্না করে সেই শিশুদের খাইয়ে তাদেরকে হাসতে না দেখেছেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমরকে দেখ! তাঁর দাপট এবং প্রতাপে একদিকে জগতের বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ কাঁপতো, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য কম্পমান ছিল, কিন্তু অপরদিকে অন্ধকার রজনীতে এক বেদুঈন নারীর সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমরের ন্যায় মহান মর্যাদার ব্যক্তি অস্থির হয়ে পড়েন। আর তিনি নিজের পিঠে আটার বস্তা তুলে এবং ঘিয়ের কৌটা হাতে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছেন আর ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরেন নি যতক্ষণ তিনি নিজ হাতে খাবার প্রস্তুত করে সেই শিশুদের না খাইয়েছেন আর তারা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে না পড়েছে।

অতঃপর একটি ঘটনা হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসেন তখন মানুষের খবরাখবর নেয়ার জন্য লোকজন থেকে পৃথক হয়ে যান। অর্থাৎ সেই কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিকে চলে যান, যেন সাধারণ জনগণের খোঁজ নিতে পারেন। তখন তিনি এক বৃদ্ধা মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে নিজ তাঁবুতে ছিল। তিনি তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হে ব্যক্তি! উমর কোথায়? তিনি বলেন, তিনি এখানেই আছেন আর সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। তখন সেই মহিলা বলে, আল্লাহ্ যেন আমার পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান না দেন। তিনি বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ; তা কেন? অর্থাৎ তুমি এই কথা কেন বলছ? সে বলে, যখন থেকে তিনি খলীফা হয়েছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোন দানদক্ষিণা পাই নি, না কোন দিনার পেয়েছি না দিরহাম। (সেই বৃদ্ধা জানত না যে, ইনিই হযরত উমর) হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ, উমর তোমার অবস্থা জানবেন কীভাবে? যখন কিনা তুমি এমন স্থানে রয়েছ, অর্থাৎ দূরে জঙ্গলের ধারে বসে আছে! তখন সেই মহিলা বলে, সুবহানআল্লাহ্। অর্থাৎ সুবহানআল্লাহ্। আমি মনে করি না যে,

কেউ মানুষের শাসক হবে আর তার এটি জানা থাকবে না যে, তার সামনে, পূর্বে ও পশ্চিমে কী আছে। তখন উমর ক্রন্দনরত অবস্থায় নিজের প্রতি মনোনিবেশ করে বলেন, **হায় উমর হায়! (এমন) কত দাবিকারকই না থাকবে, হে উমর! প্রত্যেকেই তোমার চেয়ে অধিক ধর্মের জ্ঞান রাখে।** এরপর হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, অত্যাচারিত হিসেবে তুমি তোমার অধিকার তাঁর কাছে কত মূল্যে বিক্রি করবে কেননা আমি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চাই। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, হযরত উমরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চাই, তুমি বল যে, তুমি তোমার অত্যাচারিত হওয়ার অধিকার কত দামে বিক্রি করবে? সে মহিলা বলে, আমার সাথে ঠাট্টা করো না, আল্লাহ্ তোমার প্রতি কৃপা করুন। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, এটি ঠাট্টা নয়। হযরত উমর (রা.) তাকে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে তার অত্যাচারিত হিসেবে তার অধিকার ২৫ দিনারে ক্রয় করে নেন। এই কথা চলছিল এমন সময় হযরত আলী বিন আবি তালেব এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ সেখানে আসেন আর তারা উভয়ে বলেন, **'আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন'** অর্থাৎ হে আমীরুল মু'মিনীন! আস্সালামু আলাইকুম। এতে সেই মহিলা তার হাত নিজের মাথায় রাখে এবং বলে, আল্লাহ্ মঙ্গল করুন, আমি আমীরুল মু'মিনীনকে তাঁর উপস্থিতিতে মন্দ কথা শুনিয়েছি! তখন তাকে আমীরুল মু'মিনীন বললেন, তোমার ওপর কোন দোষ বর্তায় না, খোদা তোমার প্রতি কৃপা করুন। এরপর হযরত উমর (রা.) লেখার জন্য একটি চামড়ার টুকরো চেয়ে পাঠান কিন্তু তা পাওয়া না গেলে তিনি তাঁর গায়ে জড়ানো নিজের চাদর থেকে একটি টুকরো কেটে নেন এবং লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। উমর অমুক মহিলার কাছ থেকে এটি আজকের দিন পর্যন্ত নির্যাতিতা হওয়ার অধিকার পঁচিশ দিনারে ক্রয় করেছেন মর্মে প্রত্যয়ন পত্র। এখন যদি সে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে হাশরের দিন দাবি উপস্থাপন করে তাহলে উমর তা থেকে দায়মুক্ত; আলী বিন আবি তালেব (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) এর সাক্ষী। এরপর সেই প্রমাণপত্র তিনি হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, আমি যদি তোমার পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করি তাহলে এটি আমার কাফনের সাথে রেখে দিও।

সন্তানদের বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজার ক্ষেত্রে মানুষ কীরূপ মান নির্ধারণ করে, আজকালও আমরা দেখি যে, মানুষের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। হযরত উমর (রা.) কীরূপ মানের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন– এ সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে। হযরত আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি হযরত উমর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, কোন এক রাতে আমি আমীরুল মু'মিনীন এর সাথে মদীনার বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করছিলাম। তিনি ক্ষণিকের জন্য, অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি দেয়ালে টেক দেন, তা একটি ঘরের দেয়াল ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে তিনি বসে পড়েন। তিনি শুনতে পান যে, ঘরের ভেতরে এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছিল, উঠো এবং দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি বলে, আপনি জানেন না, আমীরুল মু'মিনীন-এর ঘোষক এই ঘোষণা করেছে যে, দুধে যেন পানি না মেশানো হয়। মা বলে, এখন আমীরুল মু'মিনীনও নেই আর তাঁর ঘোষকও নেই। মেয়েটি বলে, খোদার কসম! এটি তো আমাদের উচিত হবে না যে, তাঁর সামনে আমরা আনুগত্য করব আর পেছনে তাঁর অবাধ্যতা করব। হযরত উমর (রা.) একথা শুনে অনেক খুশি হন এবং তাঁর সাথীকে বলেন, হে আসলাম! এ ঘরটি চিহ্নিত করে রাখ, অর্থাৎ এর দরজায় একটি চিহ্ন একে রাখ। পরের দিন তিনি কাউকে প্রেরণ করেন এবং সেই মেয়ের বিয়ে তাঁর পুত্র আসেমের সাথে করিয়ে দেন। তার এই সততা এবং পুণ্য দেখে নিজ পুত্রের সাথে সেই মেয়ের বিয়ে করান।

তার গর্ভে আসেম এর একটি কন্যা জন্মেছিল। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয এই মেয়েরই বংশধর ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামা বর্ণনা করেন, একবার আমি বাজার অতিক্রম করছিলাম। তখন হযরত উমর (রা.)ও কোন কাজে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে চাবুক ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে সালামা! এভাবে রাস্তা ছেড়ে চলাচল কর। এরপর আমাকে আলতো করে চাবুক মারেন, কিন্তু চাবুক আমার কাপড়ের প্রান্তে লাগে। অতএব, আমি পথ থেকে সরে যাই আর তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। এ ঘটনার পর এক বছর কেটে যায়। পুনরায় হযরত উমর (রা.)'র সাথে বাজারে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, হে সালামা! এ বছর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি? আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! হ্যাঁ। এরপর তিনি আমার হাত ধরেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে যান আর একটি থলি থেকে ছয়শ' দিরহাম আমাকে প্রদান করেন এবং বলেন, হে সালামা! এগুলো তোমার প্রয়োজনে ব্যবহার কোরো আর এটি এক বছর পূর্বে আমি তোমাকে যে চাবুকাঘাত করেছিলাম তার জরিমানা। সালামা বলেন, আমি নিবেদন করি, আল্লাহ্‌র কসম আমীরুল মু'মিনীন! আমি এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম আর আজ আপনি আমাকে স্মরণ করালেন।

হযরত উমর (রা.) এটিও লক্ষ্য রাখতেন যে, বাজারদর যেন এমন হয় যাতে কোন পক্ষের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। অতএব, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এটিও নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যে, লেনদেনের বিষয়ে যেন অনিয়ম না হয়। আমরা দেখি যে, ইসলাম এই অধিকারের বিষয়টিও উপেক্ষা করেনি। যেমন, ইসলাম বাজারদর বৃদ্ধি করা এবং অধিক মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে অনুরূপভাবে অন্যদের ক্ষতি করা এবং তাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতেও নিষেধ করেছে, যেমনটি বর্তমান যুগের বাজারে প্রচলিত রয়েছে। একবার মদীনায় এক ব্যক্তি এমন দামে আঙ্গুর বিক্রয় করছিল যে দামে অন্য দোকানীরা বিক্রয় করতে পারছিল না। হযরত উমর (রা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বকাঝকা করেন, কেননা এভাবে অন্য দোকানীদের ক্ষতি হচ্ছিল। মোটকথা ইসলাম কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস করতেও বারণ করেছে, যেন দোকানদারদেরও ক্ষতি না হয় আর সাধারণ জনগণেরও ক্ষতি না হয়।

আমের বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র কাছে আসে এবং বলে, আমার এক কন্যা ছিল যাকে অজ্ঞতার যুগে জীবিত কবরস্থ করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে মৃত্যুর পূর্বেই বের করে এনেছি। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার ওপর আল্লাহ্ তা'লার দন্ডাবলীর একটি দন্ড আরোপিত হয়। অর্থাৎ অন্যায় কাজ সাধিত হয়, যার ফলে সে দন্ডিত হয়। তখন সে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে একটি ছুরি নেয়। আমি তাকে ধরে ফেলি, তবু সে তার কিছু রগ কেটে ফেলেছিল। অতঃপর আমি তার চিকিৎসা করি। অবশেষে সে আরোগ্য লাভ করে। এরপর সে উত্তমরূপে তওবা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! এখন আমার কাছে এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসছে আমি কি এর পূর্বের বিষয়াদি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করব যে, এর পূর্বের জীবন কীরূপ ছিল, এর সাথে কী কী ঘটেছে, আর সে নিজের সাথে কী করেছে? হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার দোষত্রুটি পর্দাবৃত করেছেন, তুমি কি তা প্রকাশ করতে চাও? খোদার কসম! তুমি যদি তার বিষয়াদি সম্পর্কে কাউকে কিছু বল তাহলে আমি তোমাকে পুরো শহরবাসীর

সম্মুখে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। এটি না করে বরং সেই মেয়েকে এক পবিত্র মুসলমান নারীর ন্যায় বিয়ে দাও। (অতীতের) সব কথা ভুলে যাও।

আমওয়াস-এর প্লেগ এবং মানুষের জীবনের জন্য হযরত উমর (রা.)'র কীরূপ চিন্তা ছিল এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রামলা থেকে বায়তুল মাকদাসের পথে ৬ মাইল দূরত্বে একটি উপত্যকা রয়েছে, যার নাম হলো, আমওয়াস। ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে, এখান থেকে প্লেগ রোগের সূচনা হয় আর তা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই এটিকে আমওয়াস-এর প্লেগ বলা হয়। এই রোগে সিরিয়ায় অগণিত লোক মৃত্যুবরণ করে। কারো কারো মতে এতে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। সতেরো হিজরী সনে হযরত উমর (রা.) মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সার্গ নামক স্থানে পৌঁছে সৈন্যদলের সেনাপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সার্গ হলো সিরিয়া ও হেজাযের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তাবূক উপত্যকার একটি জনপদের নাম। আর তাঁকে এই সংবাদ জানানো হয় যে, আমওয়াস অঞ্চলে ব্যাধি ছড়িয়ে আছে। তখন পরামর্শের পর তিনি ফেরত চলে আসেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এটি পূর্বেও একবার কিছুটা বর্ণিত হয়েছে, অপর এক বরাতে। হযরত উমর (রা.) যখন সার্গ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সেনাদলের নেতৃবৃন্দ হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং তার সাথীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত উমর (রা.) পরামর্শের জন্য প্রাথমিক মুহাজিরদের নিজের কাছে ডাকেন। হযরত উমর (রা.) তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু মুহাজিরদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কারো কারো মত ছিল যে, এখান থেকে পিছু হটা উচিত নয়। অপরদিকে কেউ কেউ বলেন, এই সেনাদলে মহানবী (সা.)-এর সম্মানীত সাহাবীরা রয়েছেন আর তাদেরকে এই মহামারীতে ঠেলে দেয়া সমীচীন নয়। হযরত উমর (রা.) মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন এবং আনসারদের ডাকেন। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আনসারদের মাঝেও মুহাজিরদের ন্যায় মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) আনসারদেরও ফেরত পাঠান এবং এরপর বলেন, কুরাইশদের জ্যেষ্ঠদের ডাকো যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসেছিলেন। তাঁদেরকে ডাকা হয়। তাঁরা সমস্বরে এই পরামর্শ দেন যে, এদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে চলুন আর মানুষকে মহামারী কবলিত অঞ্চলে নিয়ে যাবেন না। হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ফেরত চলে যাওয়ার ঘোষণা করে দেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তখন প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্‌র তক্বদীর থেকে পলায়ন করা কী সম্ভব? হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দাকে বলেন, হে আবু উবায়দা! হায় তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ যদি এ কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র তক্বদীর থেকে পলায়ন করে আল্লাহ্‌রই তক্বদীরের দিকে যাচ্ছি। যদি তোমার কাছে উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন উপত্যকায় অবতরণ কর যার দুটি প্রান্ত রয়েছে, একটি সবুজ শ্যামল আর অপরটি শুষ্ক, তাহলে কি বিষয়টি এমন নয় যে, তুমি যদি তোমার উটগুলোকে সবুজ শ্যামল স্থানে চরাও তাহলে তা আল্লাহ্‌র তকদীরের অধীনে আর তুমি যদি সেগুলোকে শুষ্ক স্থানে চরাও তাহলে তা-ও আল্লাহ্ তা'লারই তক্বদীরের অধীনে। বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)-ও এসে গেলেন যিনি কোন ব্যস্ততার কারণে ইতোপূর্বে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি নিবেদন করেন, আমার কাছে এ সমস্যার সমাধান আছে। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: 'যখন কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে

পড়েছে বলে তোমরা জানতে পারবে তখন সেখানে যেও না আর তোমরা যেখানে বসবাস কর সেই এলাকায় যদি মহামারী ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।' একথা শুনে হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ফিরে যান।

হযরত উমর (রা.) মদীনা থেকে এসেছিলেন আর তখনও মহামারী কবলিত এলাকায় পৌঁছান নি তাই নিজ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেহেতু সেনাপতি ছিলেন এবং আগে থেকেই মহামারী কবলিত এলাকায় অবস্থান করছিলেন তাই তিনি এবং মুসলিম সেনাবাহিনী প্লেগকবলিত এলাকাতেই থেকে গেলেন অর্থাৎ যে যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থান করেন। মদীনা পৌঁছে হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার মুসলমানদের বিষয়ে ভাবতে থাকে, তাদেরকে প্লেগের ধ্বংসলীলা থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, বিশেষভাবে হযরত আবু উবায়দার বিষয়ে হযরত উমর (রা.) চিন্তিত ছিলেন। একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্র লিখে পাঠালেন যে, তোমার সাথে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তাই তুমি পত্র পাওয়ামাত্র দ্রুত মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যদি তুমি এই পত্র রাতে হাতে পাও তাহলে সকাল হবার অপেক্ষা করবে না আর যদি সকালে পাও তাহলে রাতের জন্য অপেক্ষা করবে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র প্রতি তাঁর ভালোবাসা খুবই প্রগাঢ় ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেই পত্র পড়ে বলেন, আমি আমিরুল মু'মিনীনের প্রয়োজন জানি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমরের প্রতি কৃপা করুন। আবু উবায়দা (রা.) মনে মনে ভাবলেন, তিনি (রা.) তাকে বাঁচাতে চান। এই মৃত্যুপথযাত্রী অর্থাৎ আমার সাথে কী হতে যাচ্ছে তা তো আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এরপর তিনি (তথা হযরত আবু উবায়দা) (রা.) উক্ত পত্রের উত্তরে লেখেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝে গেছি, আমাকে অনুগ্রহকরে ডাকবেন না। আমাকে এখানেই থাকতে দিন কেননা আমি মুসলিম সৈনিকদের একজন। অদৃষ্টে যা আছে, তা-ই হবে। আমি তাদেরকে ছেড়ে কীভাবে যেতে পারি! হযরত উমর (রা.) সেই পত্র পাঠ করে কেঁদে ফেলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! হযরত আবু উবায়দা কি পরলোক গমন করেছেন? তিনি (রা.) বললেন, না- তবে হয়তো তা-ই হবে। হযরত উমর (রা.) সুচিন্তাশীল সাহাবীদের পরামর্শক্রমে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে লিখে পাঠান যে, তুমি লোকদেরকে নিয়ে নিচু এলাকায় পৌঁছেছ তাই কোন উঁচু এবং স্বাস্থ্যকর এলাকায় চলে যাও। নিচু জায়গা পরিত্যাগ করে কোন উঁচু জায়গায় চলে যাও অর্থাৎ এমন পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানকার বাতাস হবে নির্মল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) উক্ত আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কেবল ভাবছিলেন, ইতোমধ্যে তাঁর ওপর প্লেগের হামলা হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজ স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত মুআয বিন জাবালকে মনোনীত করেন কিন্তু তিনিও প্লেগে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) নিজ স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমর বিন আস (রা.)-কে মনোনীত করেন। তিনি (তথা হযরত আমর বিন আস) একটি বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, এই মহামারি যখন দেখা দেয় তখন আগুনের মত ছড়ায় তাই পাহাড়ে লুকিয়ে হলেও নিজেদের প্রাণ রক্ষা কর। তিনি লোকদের নিয়ে সেখান থেকে বের হন এবং পাহাড়ে চলে যান। ধীরে ধীরে মহামারির প্রকোপ কমে যায় এবং কমতে কমতে অবশেষে পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বক্তব্যের বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি তা

কেবল পছন্দই করেন নি বরং সেটি আবু উবায়দা (রা.)-কে প্রেরিত তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন বলে আখ্যা দেন।

আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) ছাড়াও হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.), হযরত হারিস বিন হিশাম (রা.) এবং হযরত সুহায়েল বিন আমর (রা.) ও হযরত উতবা বিন সুহায়েল (রা.) এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সেই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আমওয়াসের প্লেগ থেকে ফেরত আসার উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যখন সিরিয়ায় যুদ্ধ হয় এবং সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সেখানে যান যাতে করে লোকদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সৈন্যদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এ রোগের প্রকোপ যখন বেড়ে যায় তখন সাহাবীরা নিবেদন করেন, **আপনার এখানে অবস্থান করা সমীচীন নয়, আপনি মদীনায় ফিরে যান**। তিনি (রা.) যখন ফিরে যেতে মনোস্থির করলেন তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, **আ ফিরারাম্ মিন কাদরিল্লাহ্?** আপনি কি আল্লাহ্‌র তকদীর থেকে পলায়ন করছেন? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, **না'আম, নাফিররু মিন কাদরিল্লাহি ইলা কাদরিল্লাহ্**। অর্থাৎ, হ্যাঁ, আমরা খোদার এক তকদীর হতে অন্য তকদীরের দিকে ধাবিত হচ্ছি। সর্বোপরি, জাগতিক উপকরণাদি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়, (বরং) হ্যাঁ, জাগতিক উপকরণাদি ধর্মের অধীনেই রাখা উচিত।

হযরত উমর (রা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে।

হযরত খাওওয়ায বিন জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মানুষ কঠিন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। তখন হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে নিয়ে বের হন এবং তাদেরকে নিয়ে দু'রাকাত ইস্তিস্কার নামায আদায় করান। অতঃপর নিজের দু'কাঁধের ওপর চাদর রাখেন। চাদরের ডানদিক বাম কাঁধের ওপর এবং বামদিক ডান কাঁধের ওপর রাখেন তথা আবৃত করেন, এরপর তিনি দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত তুলেন এবং নিবেদন করেন, **আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাগফিরুকা ওয়া নাসতাসকিকা**। অর্থাৎ, হে মহাসম্মানিত আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং বৃষ্টি কামনা করি। তিনি দোয়া করে তখনও নিজের স্থান ত্যাগ করেন নি, ইতোমধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের গ্রামের লোকেরা হযরত উমরের কাছে আসে এবং নিবেদন করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক দিন অমুক সময় আমরা আমাদের উপত্যকায় ছিলাম। (হঠাৎ) আমাদের ওপর মেঘমালা ছায়া করল এবং আমরা সেটির মাঝ থেকে একটি ধ্বনি শুনতে পেলাম আর তা হল, **আবু হাফস-এর বৃষ্টি তোমাদের কাছে এসেছে; আবু হাফস-এর বৃষ্টি তোমাদের কাছে এসেছে**।

তাঁর (রা.) একটি দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনা রয়েছে যা নীলনদ প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। নীলনদ যখন শুকিয়ে যেতো তখন ইসলামের পূর্বে সেখানকার লোকদের মাঝে সেটির নাব্যতা বজায় রাখার একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। আর সেই প্রথার কোন প্রভাব পড়তো কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন কিন্তু ইসলাম সেই কদাচারের অবসান ঘটিয়েছে এবং সে প্রথার অবসান ঘটানোর যে ঘটনা বর্ণনা করা হয় তা হলো, কায়েস বিন হিজায বর্ণনা করেন, যখন মিশর বিজিত হয় তখন সেখানকার অধিবাসীরা ইরানী মাসের কোন একদিন হযরত আমর বিন আস (রা.)'র নিকট আসে। লোকেরা বলে, হে আমীর! আমাদের নীলনদের জন্য একটি প্রথা রয়েছে

যা পালন না করলে এতে পানি প্রবাহিত হয় না। হযরত আমর জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? তারা বলল, যখন এই মাসের এগার রাত কেটে যায় তখন আমরা এক কুমারী মেয়ের নিকটে তার পিতামাতার উপস্থিতিতে যাই অতঃপর তার পিতামাকে সম্মত করাই এবং তাকে উত্তম পোশাক ও অলঙ্কারাদি পরিধান করাই তারপর তাকে নীলনদে ফেলে দেই। হযরত আমর তাদেরকে বললেন, ইসলামে এমনটি কখনও ঘটতে দেয়া হবে না। নিশ্চয়ই ইসলাম এমনসব কুসংস্কার নির্মূল করে যা ইতোপূর্বে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তারা অপেক্ষমান রইল আর তখন নীলনদে তখন কোন নাব্যতা ছিল না এমনকি লোকেরা নিজ দেশ পরিত্যাগ করার জন্য মনোস্থির করল। অর্থাৎ প্রথমদিকেই তারা নিক্ষেপ করত। কিন্তু অবশেষে এমন সময় আসল যখনকিনা নীলনদ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল আর লোকেরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার সংকল্প করল। অতএব, হযরত আমর (রা.) এহেন অবস্থা দেখে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে এবিষয়ে অবগত করলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে হযরত আমর বিন্ আস (রা.)-কে লিখেন, তুমি যা বলেছো তা একেবারেই সঠিক।

নিশ্চতভাবে ইসলাম পূর্বের সকল কুসংস্কারকে নির্মূল করে। তিনি পত্রের সাথে একটি চিরকূট (লিখে) পাঠান এবং হযরত উমর (রা.), হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে লিখে পাঠান যে, আমি আমার পত্রে তোমার জন্য একটি চিরকূট (লিখে) পাঠিয়েছি সেটি নীলনদে ভাসিয়ে দিও। হযরত উমর (রা.)'র পত্র হযরত আমর বিন আস (রা.)'র কাছে পৌঁছলে সেই চিরকূটটি যখন খুলেন তখন তাতে লেখা দেখেন, **আল্লাহ্‌র বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাব আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের প্রতি। অতঃপর যদি তুমি নিজে থেকে প্রবাহিত হয়ে থাক তবে প্রবাহিত হয়ে না কিন্তু আল্লাহ্ যদি তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তবে আমি মহাপ্রতাপান্বিত এক আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন**। সুতরাং, হযরত আমর (রা.) সেই চিরকূটিকে ক্রুশীয় উৎসবের এক দিন পূর্বে নীলনদে ফেলে দেন। (পরদিন) সকালে (দেখা যায়), মহান আল্লাহ্ এক রাতেই নীলনদে পূর্বের তুলনায় ষোল হাত বেশি পানি প্রবাহিত করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ মিশরবাসীদের এই কুসংস্কারকে নির্মূল করে দেন। অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে যদিও এই ঘটনার সত্যায়ন দেখা যায় কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র একজন জীবনীকারক মুহাম্মদ হুসেইন হ্যায়কল এ ধারণাকে এই মর্মে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এমন কোন প্রথাই ছিল না। যাহোক, এটি একটি ঘটনা।

এরপর রয়েছে হযরত সারিয়ার যুদ্ধে হযরত উমর (রা.)'র আওয়াজ শোনার ঘটনা। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এখানেও কবুলিয়তে দোয়ার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করছি এবং আল্লাহ্ তা'লার যে এক বিশেষ আচরণ ছিল (সেই প্রেক্ষাপটে)। তাবারীর ইতিহাস (গ্রন্থে) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সারিয়া বিন জুনায়েমকে **ফাঁসা** এবং **দারা আবযার্দ** অভিমুখে প্রেরণ প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে লোকদেরকে ঘিরে ফেলেন। তখন তারা নিজেদের সাহায্যের জন্য মিত্র বাহিনীকে আহ্বান জানালে তারা মুসলমান সেনাদের মোকাবিলার জন্য মরুভূমিতে সমবেত হয়। আর যখন তাদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায় তখন তারা মুসলমানদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে। জুমুআর দিন খুতবা দেয়ার সময় হযরত উমর (রা.) বলেন, **হে সারিয়া বিন জুনায়েম আল জাবাল, আল জাবাল** অর্থাৎ, **হে সারিয়া বিন জুনায়েম পাহাড়, পাহাড়**। মুসলমান সেনাদল যেখানে অবস্থান করছিল তার কাছেই একটি পাহাড় ছিল। তারা সেখানে আশ্রয় নিলে শত্রু কেবল এক দিক থেকেই

আক্রমণ করতে পারত। সুতরাং, তারা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেন আর অনেক মালে গণিমত লাভ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

সাহাবীদের এমন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরো উদ্ধৃতিটি গত খুতবায় আমি পাঠ করেছি। সুতরাং, নীলনদ প্রবাহিত হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাটিও যদি আমরা দেখি তবে এই ঘটনাটি সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়, যদিও কিছু ঐতিহাসিক (এই ঘটনাকে) সঠিক বলে বিশ্বাস করে না।

হযরত উমর (রা.)'র টুপির কল্যাণ ও রোমান সম্রাট সম্পর্কিত একটি ঘটনা রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একবার রোমান সম্রাটের মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, সকল প্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্য লাভ হয় নি। কেউ তাকে পরামর্শ দেয় যে, হযরত উমর (রা.)-কে নিজের অবস্থা লিখে পাঠান এবং তাঁর কাছ থেকে কোন তবাররুক চেয়ে পাঠান। তিনি আপনার জন্য দোয়াও করবেন এবং উপহারও পাঠিয়ে দেবেন আর তাঁর দোয়ার ফলে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। তিনি হযরত উমর (রা.)'র কাছে নিজের দূতকে প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) ভাবেন, এরা অহংকারী মানুষ। আমার কাছে এদের আশা অনেকটা অসম্ভব! এখন যেহেতু ব্যথায় জর্জরিত তাই সে তার দূতকে আমার কাছে প্রেরণ করেছে। আমি যদি তাকে অন্য কোন উপহার পাঠাই তাহলে সে এটিকে তুচ্ছ মনে করে হয়ত ব্যবহার করবে না। তাই আমার এমন কোন জিনিস পাঠানো উচিত যা তবাররুকের কাজও করবে এবং তার দর্পও চূর্ণ করবে। সুতরাং, তিনি বিভিন্ন জায়গায় দাগযুক্ত তাঁর একটি পুরোনো টুপি, যা ময়লার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল সেটি তবাররুক হিসেবে প্রেরণ করেন। এ টুপি দেখার পর সে খুব অপমান বোধ করে, তাই সে আর টুপিটি পরে নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলতে চাচ্ছিলেন, এখন তুমি কেবল মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করতে পার। তার মাথায় এত তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, সে তার চাকরবাকরকে বলে, উমর যে টুপিটি পাঠিয়েছে সেটি নিয়ে আসো যেন আমি তা মাথায় দিতে পারি। অতএব, সে টুপি পরিধান করে আর তার ব্যথা কমতে শুরু করে। যেহেতু প্রতি অষ্টম বা দশম দিনেই মাথা ব্যথা হত এজন্য এটি তার রীতি হয়ে যায় যে, সে যখনই দরবারে বসত তখন সে তার মাথায় হযরত উমর (রা.)'র সেই ময়লা ও অপরিপাটি টুপিটিই পরে বসতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে যে এই নিদর্শন দেখিয়েছেন তাতে আরেকটি বিষয়ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী সিজার বা রোমান সম্রাটের কাছে বন্দি ছিলেন আর সে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে তাঁকে যেন শুকরের মাংস খাওয়ানো হয়। তিনি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতেন কিন্তু শুকরের কাছেও যেতেন না। যদিও ইসলাম অনুসারে, বাধ্য হলে শুকরের মাংস খাওয়া বৈধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি [মহানবী (সা.)-এর] সাহাবী, তাই আমি এমনটি করতে পারি না। বেশ কয়েক দিন ক্ষুধার্ত থেকে মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে তখন সিজার তাকে রুটি দিত। তার গায়ে আবার কিছুটা শক্তি ফিরে এলে পুনরায় সে তাকে শুকর খাওয়াতে বলত। এভাবে সে তাকে মরতেও দিতো না আর (ভালোভাবে) বাঁচতেও দিত না। তখন কেউ তাকে বলে, তোমার মাথা ব্যথার কারণ হলো, তুমি এই মুসলমানকে বন্দি করে রেখেছ আর এখন তোমার একমাত্র চিকিৎসা হলো, উমরকে দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করাও এবং তার কাছ

থেকে কোন উপহার চেয়ে পাঠাও। যখন হযরত উমর (রা.) তার জন্য টুপি প্রেরণ করেন আর তার ব্যথা ভালো হয়ে যায় তখন সে এতে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে সেই সাহাবীকেও মুক্ত করে দেয়। এখন দেখো! সিজার এক সাহাবীকে কষ্ট দেয় আর আল্লাহ্ তা'লা এর শাস্তিস্বরূপ তার মাথায় ব্যথা সৃষ্টি করে দেন। তখন অন্য একব্যাক্তি তাকে পরামর্শ দেয়, উমরের কাছে উপহার চেয়ে পাঠাও আর তাকে দিয়ে দোয়া করাও। তিনি উপহার প্রেরণ করেন এবং সিজারের ব্যথা দূর হয়ে যায়। অতএব এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা সেই সাহাবীর মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং তার কাছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতা প্রকাশ করে দেন।

তফসীর রাযীতে রয়েছে, সিজার হযরত উমর (রা.)-কে লিখে, আমার মাথাব্যথা রয়েছে আর তা ভালো হচ্ছে না, আপনি আমার জন্য কোন ঔষধ প্রেরণ করুন। তখন হযরত উমর (রা.) তার জন্য একটি টুপি প্রেরণ করেন। সেটি মাথায় দিতেই তার মাথাব্যথা কমে যেত, কিন্তু যখনই সে তা মাথা থেকে খুলে ফেলত পুনরায় তার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যেত। এতে সে বিস্মিত হয় আর টুপিতে একটি কাগজ খুঁজে পায় যাতে **'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম'** লেখা ছিল। এটি তফসীরে রাযীর একটি উক্তি।

হযরত উমর (রা.)'র কতিপয় দোয়া রয়েছে। আমর বিন মায়মুন বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) দোয়া করতেন, اللّٰهُمَّ تَوَفَّنِي مَعَ الأَبْرَارِ، وَلاَ تُخَلِّفْنِي فِي الأَشْرَارِ، وَقِنِي عَذَبَ النَّارِ وَأَلْحِقْنِي بِالأَخْيَارِ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দাও, আর পেছনে মন্দ লোকদের মাঝে আমাকে রেখে দিও না এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর আর আমাকে পুণ্যবানদের সাথে যুক্ত কর।

ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মীনা থেকে ফেরার পর তাঁর উটকে কঙ্করময় ময়দানে বসান এবং মক্কার উপত্যকার পাথর দিয়ে একটি স্তুপ বানান আর এর ওপর তার চাদরের এক প্রান্ত বিছিয়ে শুয়ে পড়েন এবং নিজের হাত (দু'টি) আকাশ পানে তুলে দোয়া করেন– اللّٰهم كَبُرَتْ سِنِّي وضَعُفَتْ قُوَّتِي وانْتَشرَتْ رَعِيَتِي فاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ ولَا مُفَرِّطٍ। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার প্রজারা ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি আমাকে বিনষ্ট না করে বা কম না করে মৃত্যু দাও। এরপর যিলহজ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর ওপর আক্রমণ হয় আর তিনি শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) একটি নতুন কাজ করেন যা তিনি সাধারণত করতেন না আর তা হলো, তিনি লোকদের এশার নামায পড়িয়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন এবং সারা রাত ক্রমাগত (নফল) নামায পড়তেন। এরপর তিনি বাইরে বের হতেন এবং মদীনার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন। এক রাতে সেহ্রীর সময় আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, **"আল্লাহুম্মা লা তাজআল হালাকা উম্মাতে মুহাম্মাদিন আলা ইয়াদাই"** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, মানুষের উচিত নিষ্ঠার সাথে স্বীয় খোদা তা'লার ইবাদত করা। লোকেরা একে মন্দ বলুক বা ভালো সেটির তোয়াক্কা করা উচিত নয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ বাহ্যিক অবস্থাকে খারাপ করা মহানবী (সা.)-এর শেখানো এ দোয়া থেকে অবৈধ প্রমাণিত হয় আর সে দোয়াটি মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.) কে শিখিয়েছিলেন।

সেই দোয়াটি হচ্ছে اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমার অভ্যন্তরকে বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা উত্তম বানাও আর আমার বাহ্যিক অবস্থাকেও উত্তম বানাও।

মসজিদে নববী এবং নামাযের সম্মানের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র যত্নবান থাকা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন আমি মসজিদে দাঁড়ানো ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ্য করে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারেন। আমি তাঁর দিকে তাঁকিয়ে দেখি তিনি ছিলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। তিনি বলেন, যাও! আর এ দু'জনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দু'জন লোক উঁচুস্বরে কথা বলছিল। আমি তাদের দু'জনকে নিয়ে এলে হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমাদের দু'জনের পরিচয় কী অথবা বলেন, তোমরা কোথাকার লোক? উত্তরে তারা বলে, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমরা যদি এ শহরের বাসিন্দা হতে তবে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। তোমরা মহানবী (সা.)-এর মসজিদে উচ্চঃস্বরে কথা বলছো?

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র রীতি ছিল, (নামাযের) সারিগুলো সোজা না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহু আকবর বলতেন না। বরং সারিগুলো সোজা করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। আবু উসমান নাহ্দী বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে দেখেছি, নামাযের জন্য যখন একামত হত তখন তিনি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, হে ওমুক! সামনে আসো আর হে তমুক! পিছনে যাও, অর্থাৎ সারিগুলো সোজা করতেন। তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা রাখ। সারিগুলো সোজা হয়ে গেলে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবর বলতেন।

হযরত উমর (রা.)-এর আর্থিক কুরবানী এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এছাড় আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন এবং তিনি এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে পরামর্শ করতে আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি খায়বারে জমি পেয়েছি। আমার দৃষ্টিতে ইতোপূর্বে কখনোই আমি এরচেয়ে উত্তম সম্পদ লাভ করি নি। এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? তিনি (সা.) বলেন, তুমি চাইলে মূল জমি ওয়াক্ফ করে দাও এবং তার আয় দরিদ্রদের পেছনে ব্যয় কর। নাফে' বলতেন, এরপর হযরত উমর (রা.) সেই জমি এ শর্তে সদকা করে দেন যে, সেটি যেন বিক্রয় করা না হয় বা কাউকে দান করা না হয় অথবা উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও বন্টন করা না হয়। তিনি সেই জমি অভাবী ও আত্মীয়স্বজনের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং মুসাফির ও অতিথিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এছাড়া যে এই জমির তত্ত্বধায়ক হবে তার জন্য দোষের কিছু নেই যদি সে সেখান থেকে বিধি মোতাবেক কিছু খায় এবং (অন্যকে) খাওয়ায়; কিন্তু সম্পদ জমা করতে পারবে না। সুযোগ পেলেই হযরত উমর (রা.) অগ্রগামী হয়ে কুরবানী করার চেষ্টা করেছেন। আর সেটিও একটি সুযোগ ছিল যখন মহানবী (সা.) ধনসম্পদ কুরবানীর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে উপস্থিত হন। পূর্বেও এ ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তাঁর খোদাভীতির চিত্র হলো, মৃত্যুর সময় তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল আর তিনি বলছিলেন, **'আমি**

কোন পুরস্কারের যোগ্য নই। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, আমি যেন শাস্তি থেকে রক্ষা পাই। এমনই ছিল তাঁর খোদাভীতির অবস্থা।'

যাহোক, এখনও অল্প কিছু কথা বাকি রয়ে গেছে যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)